শতবর্ষের বাংলা গান [১৯০৫-২০০৫]

রাজু আলীম

বাংলার গান, বাংলাদেশের গান, বাঙ্গালি শ্রোতাদের কাছে এক মোহময় ভূবনের স্থান করেছে নিঃসন্দেহে। বাঙ্গালির সঙ্গীত বিশ্ব সঙ্গীত ভূবনে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। বাংলা গানের নতুন স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের বাংলা ভাষাকে ধন্য করেছে সেটা তো আমরা হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করি। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসিঃ" এই গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯০৫ সালে, আর এখন ২০০৬ সাল। একশ বছর পার করেছে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসিঃ" গানটি। বাংলাদেশ জন্মের প্রায় ৭০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখেছিলেন। বাঙ্গালি কিংবা বাংলাদেশীরা রবীন্দ্রনাথকে সুযোগ্য সম্মান দিয়েছেন গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি রবীন্দ্রনাথ। বাংলা গানের শতবর্ষের সূচনা কালের সম্রাট হিসেবে অভিসিক্ত করতে পারি তাঁকে। বাংলা গানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ট গীতিকারও তাকে ভাবতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের স্রষ্টা। এখন বাংলা গান, বাংলাদেশের গান নানা ভাবে রূপায়নের কাজ চলছে নতুন করে লেখা হচ্ছে। ভাষা ও শব্দের প্রয়োগের ভিন্নতা এসেছে সময়ের প্রয়োজনে। অনেক গীতিকার, সুরকার ও গবেষকের আবির্ভাব হয়েছে। চলছে আধুনিকতার সন্ধান। আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি জীবনের ঐক্যতান। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন মাইলস্টোনের ভূমিকায়। কারন, তাঁর ছিলো প্রচন্ড দেশাত্ববোধ। মাটির টান, প্রানের টান, দেশ ও প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ। তিনি বাংলাকে ভালোবেসে ছিলেন, প্রকৃতির চোখ দিয়ে, হৃদয়ের আকুলতা দিয়ে, প্রানের ভেতরে ছিল তাঁর বাঙ্গালীয়ানা। লোক ঐতিহ্যের ঘরানা বাসা বেধে ছিলো তাঁর বুকের মধ্যে। তিনি ভালোবেসে ছিলেন, বাংলার বাউলদেরকে। কুষ্টিয়া অঞ্চলের এক লোক প্রিয় বাউল গান " আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে ঃ"। গগন হরকরার এই বাউল গানটি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সিক্ত হয়ে নতুন মাত্রায়, নতুন গানে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের গানে উঠে আসলো বাংলার সৌন্দর্য্য প্রকৃতির রূপ অপরূপভাবে। অনুভুত হলো বাংলার জন্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের টান। মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতার দেশ বাংলাদেশ। তার লেখা গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি ঃ"। ভালোবাসার মুর্ছনায় বুকের মধ্যে চির দিনের জন্য গেঁথে রইল। রবীন্দ্রনাথ সেই মহান পুরুষ যাকে নিয়ে শতবর্ষের পরও বাংলা গান নিয়ে, বাংলাদেশের গান নিয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমি বাংলায় গান গাই ঃ বাংলায় কথা বলিঃ, বাংলায় করি সুরঃ।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একশ বছরের নির্বাচিত কিছু গান নিয়ে বিশ্বের স্থানীয় ব্যাংক এইচ.এস.বি.সি বাংলাদেশ সম্প্রতি চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করেছিলো নির্বাচিত নতুন ও পুরাতন শিল্পীদের নিয়ে শতবর্ষের গানের অনুষ্ঠান "শতবর্ষের বাংলা গান"। আর এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বাংলাদেশেরে শ্রেষ্ট সঙ্গীতবোদ্ধা, শিল্পী, কলা-কুশলী ও দেশের শিল্প সাহিত্য, সাংস্কৃতির বিশিষ্ট জনেরা। দেখা গেছে প্রবীন, নবীন শিল্পীদের ও। শতবর্ষের গানের এই আয়োজনের এই অনুষ্ঠানে একশ বছরের গান নিয়ে কথা বললেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিত্ব বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুলস্নাহ আবু সায়ীদ। বরেণ্য সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ করম্নণাময় গোস্বামী। শতবর্ষের গানের উদ্যোক্তা এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্ট্রীপ বেনার এবং কর্পোরেট ব্যাংকিং হেড মাহবুবুর রহমান এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়

ভালো বাসি"ঃ রচিত ও গীত হয়েছিলো ১৯০৫ সালে। সেই সময় থেকে বাংলা গানের বিকাশের যে পর্ব শুরু তার ধারাবাহিক ঐতিহ্য আজ একশ বছর পরও আমাদের গৌরব। গীত সংকলন গীতাঞ্জলির জন্য এই শতবর্ষের সুচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা গানের বহুমাত্রিক সমৃদ্ধির জন্য কাজ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনী কান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯০৫ থেকে ২০০৫ শতবর্ষ হচ্ছে বাংলা গানের উজ্জল পর্ব। একটি মাত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরা কঠিন। তবে ঢেউয়ের চুড়া স্পর্শ করার মত করে প্রতি দশকের নির্বাচিত গান ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে। বিশ্বের স্থানীয় ব্যাংক হিসেবে এইচ এস বি সি দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে সম্পৃক্ত থাকবার ব্যাপারে বরাবরই আগ্রহী । অনুষ্ঠানটির আয়োজন এরই একটি ধারাবাহিক প্রয়াস। এইচ এস বি সি'র বিশ্বাস, দেশের খ্যাতনামা গবেষকদের অবদান এবং প্রাথিতযশা কণ্ঠশিল্পীদের আন্তরিক অংশগ্রহণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আপনাদের আনন্দ দেবে, বিগত শতাব্দীর সংস্কৃতির মূল সুত্রগুলা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের মাস ফেব্রুয়ারী। একুশে ফেব্রুয়ারী আজ বিশ্বমাতৃভাষা দিবস হিসেবে সম্মানিত। এইচ এস বি সি শতবর্ষের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের জন্য তাই ফেব্রুয়ারীকে বেছে নিয়েছে।

দেশাত্মবোধের গান লেখার জোঁয়ার শুরু হয়েছিলো ১৯০৫ সাল থেকে। রবীন্দ্রনাথের গানে ছিলো বাউলের সুর মাধুর্য্য ও অন্তরের আকুলতা। ধিরেন্দ্রনাথ রায় রাগ সঙ্গীতের পশ্চাত্যের সুর মিশিয়ে নতুন রীতি তৈরী করেছিলেন।

প্রথমেই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কয়েকটি নির্বাচিত গান দর্শকদের শোনান হয়। অনুষ্ঠানে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি" গানটি যখন দেশের সেরা সঙ্গীত শিল্পীরা এক সাথে গেয়ে উঠেন তখন সমস্ত হল রুমের মধ্যে জেগে উঠে সোনার বাংলার জন্য নতুন আকুলতা। সবাই জাতীয় সঙ্গীতকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান। এর পর রবীন্দ্রনাথের "আমি বাংলাদেশের হৃদয় হতে" গেয়ে শোনান বিশিষ্ট শিল্পী মিতা হক সহ কয়েকজন শিল্পীরা। "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" সামিনা চৌধুরীর কণ্ঠে শোনেন শ্রোতারা। দিজেন্দ্র লাল রায়ের বঙ্গ আমার জননী আমারঃ গানটি সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন এস এম খালেক, অনিমা রায় নির্ঝর চৌধুরী, দেবাশীস বিশ্বাস, মিতা হক, চন্দনা মজুমদার, খায়রুল আনাম শাকিল, শাহিন সামাদ এবং মহিউজ্জামান চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মহান পুরুষ। এছাড়া বাংলা সঙ্গীতে প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন ডি এল রায়, রজনী কান্ত, হাসন রাজা, কাজী নজরুল ইসলাম, মুকুন্দ দাস, আব্বাসউদ্দিন, অতুল প্রসাদ প্রমুখ বরণ্য জনরা।

বাংলা গানের শতবর্ষের ২য় দশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীত সংকলন গীতাঞ্জলীর জন্য নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন। ১৯১০ সালে রজনীকান্ত, ১৯১৩ সালে ডি এল রায় দেহত্যাগ করেন। কিন্তু বাংলা সঙ্গীতে রেখে যান অজস্র গান। ঐ সময়ে অতুল প্রসাদও রবিন্দ্রনাথের মতই দেশাত্মবোধক গান রচনা থেকে সরে দাঁড়ান। বাংলা দেশাত্মবোধক গানে আসে শূন্যতা। তখন কলম ধরেন কবি মুকুন্দ দাস। একই সময়ে আবির্ভাব ঘটে ড়্গাংলা গানের আরেক গৌরব বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের। তিনি পরে বাংলা গানের কালের কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ দশকে সিলেটের দেওয়ান হাসন রাজা অসামান্য সুর সমৃদ্ধ গান রচনা করেন।

অনুষ্ঠানে নজরুলের “কারা ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট”ঃ। বিশিষ্ট শিল্পীরা কোরাস সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। হাসন রাজার বিখ্যাত গান “মাটির পিঞ্জিরা”ঃ চন্দনা মজুমদার গেয়ে শোনান।

ঢাকার কবি মুকুন্দ দাস রচিত বিখ্যাত গান ভয় কি মরনেঃগানটি পরিবেশন করেন সম্মিলিত কণ্ঠ শিল্পিরা।

১৯১৬ থেকে ১৯২৫ এ রচিত রবীন্দ্রনাথের গান, সেদিন দুজনে দুলেছিনো বনেঃ গানটি মিতা হক ও মহিউজ্জামান চৌধুরী পরিবেশন করেন। রোমান্টিক গান রচনা যে রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ রচনা করলেন তা নয় কাজী নজরম্নল ইসলাম ও যোগ দিলেন এ ধারায়। তিনি লিখলেন গজল। ১৯২৬ এর পরে রচিত নজরম্নলের গান ‘গুল বাগিচার বুলবুলি তুইঃ’ গানটি পরিবেশন করেন শাহিন সামাদ। আব্বাস উদ্দিনের গাওয়া ঐতিহাসিক গান ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই’ সেই সময় নাগরিক সঙ্গীতে এনেছিল নতুন মাত্রা। এ গানটি পরিবেশন করেন চন্দনা মজুমদার। একই সময়ে রচিত নজরম্নলের ইসলামিক গান ‘এ কোন মধুর সারাব দিলে’ এ গানটি রেকর্ডে প্রচারিত হয়ে স্রোতা সমাজকে মুগ্ধ করেছিল সেই সময়ে। শাহীন সামাদের কণ্ঠে নজরম্নলের এ গানটি যখন গাইছিলেন চীন মৈত্রী হল কড়্গে দর্শকশ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, ফিরে গিয়েছিলেন নজরম্নলের যুগে । এরপর মিতা হক অতুল প্রসাদের ‘নদী নাহি আখি পাতে’ শোনান। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৭৬। অসুস্থতার মাঝে ও গান রচনা করলেন ‘বর্ষা মঙ্গলের। আমি তখন ছিলেম ঘুমের ঘোরেঃ’ মিতা হক অসম্ভব দরদী কণ্ঠে গানটি গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের বিমোহিত করেছিলেন। শচিন দেব বর্মনের একটি গান পরিবেশন করা হয় এ অনুষ্ঠানে। গানটি গেয়ে শোনান খায়রুল আনাম শাকিল।

২০০৬ শচীন দেববর্মনের জন্মশতবর্ষ। শচীন দেব বর্মনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হিসেবে তাঁর কালজয়ী গান ‘ তুমি যে গিয়াছে বকুল বিছানো পথেঃ’ নিবেদন করা হয়। সুকান্তের গণসঙ্গীত ‘রানার ছুটেছে রানারঃ’ তিমির নন্দী পরিবেশন করেন।

শতবর্ষের বাংলাগানের আর এক সুবর্ণ সময় হিসেবে ধরা হয় ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে ইংরেজী শাসনের অবসান ঘটে। ভারত ও পাকিস্থান এই দুই রাষ্ট্র ভাগ হল উপমহাদেশ। পূর্ব বাংলাকে নিয়ে গঠিত পাকিস্থানের পূর্বাঞ্চল পশ্চিম বঙ্গ ভারতের একটি রাজ্যে পরিনত হয়। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ট বাঙ্গালি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা হবে কি না, সে নিয়ে মত বিরোধ দেখা দেয়।

পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন উর্দুই হবে পাকিচ্চানের রাষ্ট্রভাষা। ঢাকায় ছাত্র জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঢাকার রাজপথ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রম্নয়ারী শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়। মাতৃভাষার জন্যে আত্মোউৎসর্গের এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী রচনা করেন অমর ভাষা সংগীত “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভূলিতে পারি”। শহীদ আলতাফ মাহমুদের সূরে এই গানটি শুধু ভাষা সংগ্রামেরই নয়, এদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের উৎস সংগীত হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারনত এই দীর্ঘ গানটির প্রথম অংশটি গাওয়া হয়।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ দশকের সর্বপ্রধান গান হিসেবে সম্পূর্ন গানটি উপস্থাপন করা হয় শতবর্ষের বাংলা অনুষ্ঠানে। শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গেযে উঠেন ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে

ফেব্রুয়ারীঃ’। হল তখন পীনপতন নীরবতা। দর্শক শ্রোতা বিমোহিত চিত্তে শুনছেন একুশের গান।

ঢাকায় ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বেতার কেন্দ্র। তখন বেতার কেন্দ্রিক সঙ্গীত চর্চা পায় প্রাধান্য। কোলকাতা থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা তখন ঢাকায় এসে সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেন। আব্বাস উদ্দিন এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আব্দুল আহাদের নাম ও বিশেষভাবে উলেস্নখ করার মত। কবিগুরুর জীবদ্দশায় শান্তি নিকেতন এর প্রথম বাঙ্গালী মুসলনমান ছাত্র আব্দুল আহাদ দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গানে অবদান রেখে গেছেন। এ সময় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ছায়ানট ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমী। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় প্রথম মুখ ও মুখোশ পূর্নদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মান করা হয়। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন সমর দাস। ১৯৫৮ সালে গড়ে ওঠে এফ.ডি.সি।

১৯৬০ থেকে ৭০ এর দশকে ঢাকায় নির্মিত কয়েকটি সিনেমা থেকে কিছু গান বেরিয়ে আসে। খান আতাউর রহমান,সত্য সাহা, বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেন। চলচ্চিত্রের বাইরেও কিছু চমৎকার গান রচিত হয়। শিল্পি আব্দুল আলীম তখন দরাজ কণ্ঠে লোকগীতি বিশেষ করে ভাটিয়ালীকে শিল্পের অসামান্য মর্যাদা দেন। ৬০ থেকে ৭০ দশকের অনেকগুলো গান পরিবেশন করা হয় এইচ.এস.বি.সি’র আয়োজনে শতবর্ষের বাংলা গানের এই অনুষ্ঠানে।

মান্নাদের গাওয়া বিখ্যাত গান ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটাঃ’ গেয়ে শোনান সুবীর নন্দী। হলভর্তি মানুষ মুহুর্মুহু করতালিতে আবার বরন করেন মান্না দে কে। গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের কথায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়’র সুরে ‘মাগো ভাবনা কেনঃ’ গানটি শোনান মুহিজ্জামান চৌধুরী। ঢাকার গান থেকে নির্বাচিত আধুনিকগান ‘সাগরের তীর থেকেঃ’ গানটি গাইলেন বিখ্যাত শিল্পি শাহনাজ রহমত উলস্নাহ। আব্দুল আলীমের বিখ্যাত গান ‘আর কত কাল ভাসব আমিঃ’ গেয়ে শোনান আবু বকর সিদ্দিক। দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন পর পর দুটি চলচ্চিত্রের গান গাইলেন, ‘ একি সোনার আলোয়ঃ’ এবং ‘শুধু গান গেয়ে পরিচয়ঃ’।
১৯৬০ থেকে ১৯৭০ দশকের শেষ পরিবেশনা ‘সূর্যস্নান’ ছবির গান, ‘পথে পথে দিলাম ছড়াইয়াঃ’ গাইলেন কণ্ঠশিল্পী আগুন।

১৯৭০ সালের সবচেয়ে উলেস্নখযোগ্য বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। এই দশকের দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গানগুলির মধ্যে একটি ফুলকে বাচাঁবো বলেঃ, এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতাঃ, এই পদ্মা এই মেঘনাঃ, তোমরা ভূলে গেছ মল্লিকাদের নামঃ, আমি বৃষ্টির কাছ থেকে কাদঁতে শিখেছিঃ, আর নয় গুন গুনঃ, বিমুর্ত এই রাত্রি আমারঃ, ওরে নীল দরিয়াঃ, কেউ কোন দিন আমারে তো কথা দিল নাঃ পরিবেশন করেন যথাক্রমে আপেল মাহমুদ, শাহনাজ রহমত উলস্নাহ, ফরিদা পারভিন, সুবীর নন্দী, আবিদা সুলতানা, আগুন এবং সাবিনা ইয়াসমিন।

১৯৮০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়ের গানের উপস্থাপনা শতবর্ষ গান অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে রাখা হয়েছে।

দেশাত্মবোধক গান সবকটা জানালা খুলে দাওনাঃ বিখ্যাত গানটি গাইলেন সাবিনা ইয়াসমিন। কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে ফিরেঃ গানটি গেয়ে শোনালেন সামিনা চৌধুরী। মন শুধু মন ছুয়েছেঃগানটি শোনালেন নকিব খান।

বিশ্বের স্থানীয় ব্যাংক এইচ.এস.বি.সি বাংলাদেশের আয়োজনে শতবর্ষের গান অনুষ্ঠানে সর্বশেষ পরিবেশনা ছিল আমি বাংলায় গান গাই গানটি। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানটি রচনা করেছিলেন অনেক আগেই। এই গানটির আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটেছে সমসাময়িক বাংলাদেশে। আবহমান

বাংলার অনুসঙ্গে রচিত এই ঐতিহাসিক গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী টানা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন সংবাদ উপস্থাপক সামিয়া জামান।

এইচএসবিসি'র আয়োজনের শতবর্ষের গানের অনুষ্ঠানে অনেক শিল্পি, কলাকুশলী অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এবং অনেক বিখ্যাত গানও স্থান পায়নি নানা কারনে। তারপরও এই ধরনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশের "শতবর্ষের গান" নিয়ে এইচ.এস.বি.সি'র আয়োজন অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাদের এই আয়োজনে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীতে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে এগিয়ে আসবে হয়তো।

তথ্য সূত্র ঃ করুণাময় গোস্বামী